ইফতারের দোয়া ঃ আলাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়াবিকা আমান্তু ওয়া-আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া-আলা রিযকিকা আফ্তারতু

Dua of Iftar: Allahumma laka sumtu owabika amantu owa -alaika tawakkaltu owa-ala rizkika aftartu

Gift for Ramadanul Mubarak

Timetable for Sahri & Iftar – 1433 Hijri, 1419 Bangla, 2012 AD

Beginning of Ramadan depends on the sight of the moon

For Dhaka & Adjacent Areas

Rahmat 10 Days

Date		Day	Last time of Sahri	Iftar
Ramadan	July			
01	21	Sat	3.53	6.50
02	22	Sun	3.54	6.50
03	23	Mon	3.55	6.50
04	24	Tue	3.55	6.49
05	25	Wed	3.56	6.49
06	26	Thu	3.57	6.48
07	27	Fri	3.58	6.48
08	28	Sat	3.58	6.47
09	29	Sun	3.59	6.47
10	30	Mon	3.59	6.46

Magfirat 10 Days

Date		Day	Last time of Sahri	Iftar
Ramadan	July / August			
11	31	Tue	4.00	6.45
12	01	Wed	4.00	6.45
13	02	Thu	4.01	6.44
14	03	Fri	4.02	6.44
15	04	Sat	4.02	6.43
16	05	Sun	4.03	6.42
17	06	Mon	4.04	6.42
18	07	Tue	4.04	6.41
19	08	Wed	4.05	6.41
20	09	Thu	4.06	6.40

Najat 10 Days

Date		Day	Last time of Sahri	Iftar
Ramadan	August			
21	10	Fri	4.06	6.39
22	11	Sat	4.07	6.39
23	12	Sun	4.07	6.38
24	13	Mon	4.08	6.37
25	14	Tue	4.08	6.36
26	15	Wed	4.09	6.35
27	16	Thu	4.10	6.35
28	17	Fri	4.10	6.34
29	18	Sat	4.11	6.33
30	19	Sun	4.11	6.32

To be deducted from the mentioned time

Name of Area	Sahri	Iftar
Sylhet	5.m	7.m
Chittagong	3.m	6.m
Noakhali	2.m	5.m
Feni, Comilla	4.m	4.m
Chandpur, Mymensingh, Tangail	1.m	1.m
Barisal, Patuakhali	1.m	2.m

GULSHAN CENTRAL MASJID & IDDGAH SOCIETY

111, Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka-1212, Tel : 8829243

E-mail: gcmisbd@gmail.com, Web: www.gcmisbd.org

To be added to the mentioned time

Name of Area	Sahri	Iftar
Khulna	5.m	2.m
Rangpur	2.m	1.m
Dinajpur	6.m	4.m
Faridpur, Rajshahi	7.m	7.m
Jessore, Kushtia	7.m	7.m
Bogora, Pabna	1.m	0.m

রিসার্চ প্রকাশনা

১ম বর্ষ ঃ ১ সংখ্যা - রমজান ১৪৩৩, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২

IRSB

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি

সূচী পত্র

- ❖ প্রারম্ভ কথা - এম এ হান্নান ২
- ❖ পবিত্র কোরআনে ধনসম্পদ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ'র বাণী - সৈয়দ আহমাদ ৪
- ❖ রোজার তাৎপর্য - মাওলানা মাহমূদুল হাসান ১০
- ❖ Zikrullah - মুফলেহ আর ওসমানী ১৪
- ❖ মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রসঙ্গ, মধ্যপন্থা, জেহাদ ও রেনেসাঁ - এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল ১৮
- ❖ আধুনিক জীবন ও ইসলাম - মোহাম্মাদ জাফর ২১
- ❖ Ghazzali and Purification of Heart - Syed Rezaul Karim ২৬
- ❖ স্রষ্টাপ্রেম ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা - ড. মুহাম্মদ অব্দুল মুনিম খান ২৮
- ❖ ভোগ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন - ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ ৩৫
- ❖ বাংলাদেশে ইসলামের সেবায় আমাদের কর্তব্য - কবি রুহুল আমিন খান ৩৯
- ❖ Riba and its Types - Dr. Mahammed Haider Ali Miah ৪৪
- ❖ গুলশান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বিভিন্ন জু'মায় প্রদত্ত খুতবার উদ্ধৃতাংশ ঃ - খতীব মাওলানা মাহমূদুল হাসান ৪৮
- ❖ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির কার্যক্রম - এম এ হান্নান ৫২
- ❖ রোজার জরুরি মাসআলা ৫৭
- ❖ Members of the Executive Committee of the Gulshan Central Masjid And Iddgah Society ৫৮
- ❖ Members of the Governing Body of the Islamic Research Society ৫৯

প্রারম্ভ কথা ঃ

আলহামদুলিল্লাহ্ ! আমাদের পূর্বসূরী মুরব্বীদের গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসৃত ও প্রদর্শিত পথে-সিরাতুল মুস্তাকিমের হেদায়েত নসীবের লক্ষ্যে ঈমান-ইল্‌ম-আমলের সঠিক পথের সন্ধান ও অন্বেষার উদ্দেশ্যে 'ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটি বাংলাদেশ' (প্রস্তাবিত) -এর উদ্যোগে একটি রিসার্চ প্রকাশনা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে সর্বপ্রথম মহান আলাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট শোকর আদায় করছি এবং প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে সুপ্রিয় পাঠকদের অবগতির জন্য আমাদের গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির গঠনতন্ত্র (Memorandum of Association) এর কিছু ধারা উল্লেখ করতে চাই ঃ

1. This is a Socio-religious organization for performance of religious rites, learning and research.
2. The aims and objects of the Masjid Society shall be as under : b) To develop the Masjid into an ideal seat of Islamic Culture, learning and Research & to print & publish books, periodicals, journals, literature, research paper etc. in furtherance of the aims & objects of the Society.

উক্ত ধারার প্রেক্ষিতে আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি এবং এর উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে তার নক্‌শা বিগত ০৭/০৯/১৯৭৭ইং তারিখে তৎকালীন ডি.আই.টি থেকে অনুমোদন করা হয়েছে, সয়েল টেস্ট করা হয়েছে এবং তখন থেকেই এটি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলছে। বিগত জানুয়ারী ১৯৮২ সালে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার চালু করে সেখানে ২টি কোর্সও চালু করে কিছুদিন পরিচালিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থের অভাবে তা বন্ধ করে দিতে হয়। তাছাড়া ১৯৮৩ সালে একটি মাসিক পত্রিকা 'আল-ইসলাম' নামে প্রকাশ করা হয়, যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন আমাদের সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি মরহুম কাজী এ গোফরান, সেটিও ওই একই কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর থেকে ইসলামী রিসার্চ সেন্টারের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অসংখ্যবার কার্যকরী কমিটির সভায় ও বার্ষিক সাধারণ সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে, বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছে যথাঃ- সৌদি এ্যাম্বেসি, কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, ধাবি গ্রুপ ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।

পরবর্তীতে ০৮/০৮/২০০৭ইং তারিখে আমরা একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কাছে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের একটি ইমারত নির্মাণের জন্য প্রস্তাব পাঠাই। তারা আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের নকশা অনুমোদন করে এর কিছু অংশ প্রতিমাসে ৯০ লক্ষ টাকা ভাড়া ঠিক করে অগ্রিম ২০ কোটি টাকা দিয়ে ইমারত নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পূর্বেই উক্ত কোম্পানি ইহুদি নাসারাদের মালিকানাধীন হওয়ায় আমাদের সদস্যগণের আপত্তি থাকার কারণে সেই উদ্যোগ বাতিল করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশ কিংবা মুসলিম দেশের কোন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির তরফ থেকে অনুরূপ কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় কিনা তারও প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তার কোন সুফল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিগত ২০০৮ইং সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের জোর দাবির প্রেক্ষিতে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। আমাদের কার্যকরী কমিটির সুযোগ্য দু'জন সদস্য সাবেক রাষ্ট্রদূত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও বিচ-এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মুফলেহ আর ওসমানী এবং এক্সিম ব্যাংক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য পরিচালক জনাব এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুলের নেতৃত্বে

৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত ২৮ আগস্ট, ২০০৯ইং ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং বর্তমানে ১২ সদস্যবিশিষ্ট গভর্নিং বডি এর বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমাদের ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটির কাজ শুরু করার জন্য একজন পরিচালক (গবেষণা) ও একজন গবেষণা সহযোগী নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য একটি ওয়েব সাইটও (www.irsb.net) খোলা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা একটি 'রিসার্চ প্রকাশনা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাদের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সার্বিক অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার চিন্তা যেসব মুরিব্বী করেছেন তারা হলেন ঃ সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব মরহুম দেওয়ান আব্দুল বাছেত, বিচারপতি আব্দুল জব্বার খান, মরহুম মশিহুর রহমান, মরহুম মোঃ শাহজাহান, সোসাইটির প্রথম মহাসচিব মরহুম ক্যাপ্টেন নুরুদ্দাহার, প্রথম খতিব মরহুম মাওলানা আব্দুস সালাম প্রমুখ। তাঁরা সকলেই সূচনালগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করে ইন্তেকাল করেছেন। তাদের আরাধ্য কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের সকলের। তাই আমি গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ্ সোসাইটির তরফ থেকে সকলকে অনুরোধ জানাবো, আবেদন জানাবো - আসুন আমরা সকলে মিলে এই প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হই এবং এগিয়ে আসি।

বর্তমান বিশ্বে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে তাতে আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটেছে সত্য তবে মানুষের বিবেক, বিবেচনা, নৈতিকতাবোধ এবং আত্মিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। মানুষে মানুষে রেষারেষি, হানাহানি, খুন-খারাবি, মাদকদ্রব্য সেবনের প্রবণতা বৃদ্ধি, তরুণ সমাজের অপসংস্কৃতি চর্চা, পরিবারের বন্ধন ও আন্তরিকতা হ্রাস পেলেও মসজিদের সংখ্যা এবং নামাজির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ভাল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। মানুষের বিবেক বিবেচনা যেন দিন দিন লোপ পাচ্ছে। বিশেষ করে ইসলামী মূল্যবোধের প্রগাঢ় অবক্ষয় হয়েছে। এমন সামাজিক দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের চারিত্রিক উন্নতির লক্ষ্যে আমাদের এই প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ একটি ভাল প্রকাশনা ও যুগোপযোগী লেখা একটি জাতিকে তথা সমাজকে দুর্বল অবস্থা থেকে উত্তরণে এবং সমাজে বসবাসরত মানুষকে সৎ ও ভাল পরামর্শ দিয়ে নৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সর্বোপরি একটি সৎ ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের কাঙ্ক্ষিত যুগোপযোগী ও সৃজনশীল লেখা সম্বলিত প্রকাশনা যেন সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে আদর্শ সমাজ গঠনের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কাজে আসে তার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করি। পরিশেষে গবেষণা প্রসঙ্গে আলাহ্'র কালামে পাকের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই ঃ

"উহারা কি কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না ? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ ? (সূরা মোহাম্মদ আয়াত-২৪)

এম এ হান্নান
সেক্রেটারী জেনারেল
গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি

পবিত্র কুরআনে ধনসম্পদ সম্বন্ধে মহান আলাহ্'র বাণী ঃ

সূরা আল বাক্বারা ২

আয়াত ২৪৫) এমন কে আছে - যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে ? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ্র বা সচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আয়াত ২৫৪) হে মুমীনগণ ! আমি তোমাদিগকে যে উপজীবিকা (রিজিক দান) করেছি তা হতে সে দিন সমাগত হওয়ার পূর্বেই ব্যয় কর যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী।

আয়াত ২৬৭) হে মুমিনগণ ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর।

আয়াত ২৭২) ... ... তোমরা ধনসম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুত তা তোমাদের নিজেদের জন্য; আর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টা ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) অর্থ ব্যয় করো না এবং তোমাদের হালাল সম্পদ হতে যা ব্যয় কর তা সম্পূর্ণভাবে পুনঃ প্রাপ্ত হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

আয়াত ২৭৩) দান খয়রাত ওই সব লোকের জন্য যারা আল্লাহ্'র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। তাদের সাবলীল চলাফেরার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবহীন মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে না এবং তোমরা বৈধ সম্পদ থেকে যা ব্যয় কর সে বিষয়ে (আল্লাহ্) সম্যকরূপে অবগত।

আয়াত ২৭৪) আর যারা রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

আয়াত ২৭৬) সুদকে আল্লাহ ক্ষমা করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। বস্তুত আলাহ অতি কৃতঘ্ন পাপাচারীদের ভালবাসেন না।

সূরা আলে ইমরান ৩

আয়াত ১৩৪) যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানবদেরকে ক্ষমা করে; বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (আয়াত ১৮৬) অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে।

সূরা আন্ নিসা ৪

আয়াত ৩৮) এবং যারা লোকদের দেখাবার জন্য স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্'র প্রতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর যার সহচর শয়তান সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে। (আয়াত ১১৪) যে ব্যক্তি দান খয়রাত করে ... ... এবং আল্লাহ্'র প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ওই রূপ করে আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব।

("দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য, লোকে যাহা বলে ইহারা তাহা হইতে পবিত্র। ইহাদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা নূর- ২৬)]

য়িদা ৫

বং আল্লাহ্ বলেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় ামার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ এবং আল্লাহ্কে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক, তা হলে আমি অবশ্যই গুলি তোমাদের থেকে মোচন করে দিব।

নআম ৬

আর তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর করেছেন, উদ্দেশ্য হল তোমাদের তিনি যা কিছু দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা করা।

নফাল ৮

ার তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র এবং নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে।

ার তোমরা আল্লাহ্'র পথে যা কিছু ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবে না।

বং যারা আত্মীয় তারা আল্লাহ্'র বিধান মতে একে অন্য অপেক্ষা হকদার।

ার যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহ'র পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক বাদ শুনিয়ে দাও। (আয়াত ৬০) ছদক্বাহ তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরিবদের এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য আর দায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং যাদের মন রক্ষা করতে অভিপ্রায় হয় (তাদের) আর গোলামদের গজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে) আর আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদে অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম ও র জন্য, আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে।

ার তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, ছালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে সহায় সম্পদ) দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, কালের ঘর (শুভ পরিণাম)।

৪

ামার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে বল ছালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি া ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে - সে দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।

পনি মুমিন নারীদিগকে বলে দিন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তাহারা প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত ৬)]

সূরা বনী ই

(আয়াত ২৯)
মুক্ত হস্তও হয়ে

সূরা রূম ৩

(আয়াত ৩৮)
করে তাদের জ
(আয়াত ৩৯)
না। বরং আল্লা

সূরা সাবা ৩

(আয়াত ৩৭)
ঈমান আনে ও
থাকবে।
(আয়াত ৩৯)
ওটা সীমিত ক

সূরা ফাতির

(আয়াত ২৯)
তা গোপনে ও

সূরা যারিয়া

(আয়াত ১৯)

সূরা নাজ্ম্

(আয়াত ৩৮)
(আয়াত ৪৮)

সূরা আর র

(আয়াত ৯)
(আয়াত ৬০)

*[আল্লাহ্ ও তাঁহার
কেহ আল্লাহ ও তাঁ*

া ১৭

ামার হাতটা তোমার গর্দানের কাছে আটকে রেখো না (অর্থাৎ বদ্ধমুষ্টি হয়ো না) এবং একেবারে া হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

, আত্মীয়কে দিয়ে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা া শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।

ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায় ষ্টি লাভের আশায় তোমরা যা যাকাত দান করে থাক তার পরিবর্তে তোমরা দ্বিগুণ প্রাপ্ত হবে।

র ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; তবে যারা র্ম করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদ

বলুন ঃ নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন, অথবা তামরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্ক্ দাতা।

ারা আল্লাহর কিতাব কুরআন পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্ক্ দিয়েছি া ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নাই।

দের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।

নকারী অপরের বোঝা বহন করবে না (অর্থাৎ নিজের গোনাহের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে)। নিই আল্লাহ্ যিনি অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।

৫৫

ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।
াজের জন্য একমাত্র উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে ?

:) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। সাঃ)কে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে। (সূরা আহযাব - ৩৬)]

সূরা হাদীদ ৫৭

(আয়াত ৭) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।

(আয়াত ১০) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না ? অথচ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই।

(আয়াত ১১) এমন কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ ? তাহলে তিনি বহু গুণে একে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

(আয়াত ১৮) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

(আয়াত ২০) বস্তুত পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

(আয়াত ২৪) যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়; আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

সূরা হাশর ৫৯

(আয়াত ১৮) হে মু'মিনগণ ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আবারও বলছি যে, আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

সূরা মুনাফিকূন ৬৩

(আয়াত ৯) হে মু'মিনগণ ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা এমনটা করবে (অর্থাৎ উদাসীন হবে) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(আয়াত ১০) আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক্ দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বেই (অন্যথায়) সে বলবে ঃ হে আমার রব ! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি ছদকাহ করতাম এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না। যখন মৃত্যুর সময় হয়ে যাবে।

সূরা তাগাবুন ৬৪

(আয়াত ১৫) তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ মাত্র; আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহা-পুরস্কার।

(আয়াত ১৬) তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শোনো এবং তাঁর আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম।

(আয়াত ১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ওটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল।

সূরা হাক্কক্কা ৬৯

(আয়াত ২৮) (যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে) আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এলো না।
(আয়াত ২৯) আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।

সূরা মুয্যামমিল ৭৩

(আয়াত ২০) আর তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর।

সূরা মুদ্দাছছির ৭৪

(আয়াত ৬) (লোকদের হইতে) অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না।

সূরা ক্বিয়ামাহ ৭৫

(আয়াত ১৩) সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে।

সূরা আদ-দাহার ৭

(আয়াত ৮) তারা আল্লাহর মহব্বতে (সন্তুষ্টির জন্য) অভাবগ্রস্ত ইয়াতিম ও বান্দাকে আহার্য দান করে।

(আয়াত ৯) এবং তারা বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।

সূরা ইনফিতার ৮২

(আয়াত ৪) এবং যখন কবর উন্মোচিত হবে।

(আয়াত ৫) তখন প্রত্যেককে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে পরিত্যাগ করেছে তা পরিজ্ঞাত হবে।

সূরা ফজর ৮৯

(আয়াত ২০) এবং তোমরা ধনসম্পদের অত্যধিক মায়া করে থাক।

সূরা লাইল ৯২

(আয়াত ১১) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।

(আয়াত ১৮) যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে (১৯) এবং তার প্রতি কোন অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়। (২০) বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায়। (২১) সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।

সূরা দুহা ৯৩

(আয়াত ৯) অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। (১০) আর সওয়ালকারীকে ভৎসনা করো না। (১১) তুমি তোমার রবের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাকো।

সূরা আদিয়াত ১০০

(আয়াত ৬) মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী এবং (৮) অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন।

সূরা তাকাসুর ১০২

(আয়াত ১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে (২) যতক্ষণ না তোমরা কবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। (৩) এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। (৮) এর পর অবশ্যই সে দিন তোমরা সুখ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

সূরা হুমাযা ১০৪

(আয়াত ১) দুর্ভাগ্য প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (২) যে অর্থ জমা করে ও তা গুনে গুনে রাখে (৩) সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে (৪) কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।

সূরা মাউন ১০৭

(আয়াত ১) তুমি কি দেখেছ তাকে যে কর্মফল দিবসকে (ক্বিয়ামতের দিন) মিথ্যা বলে থাকে ? (২) সে তো সেই, যে (ইয়াতিম) পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। (৩) এবং সে অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না।

(বাংলা ভাষ্য ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক অনুবাদিত 'কুরআন মাজীদ বাংলা অনুবাদ' হইতে গৃহীত)

সংকলনে ঃ
সৈয়দ আহমাদ
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি

রোযার তাৎপর্য ঃ

রোজার বৈশিষ্ট্য ঃ

রমযান মাসের রোযার অগণিত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যার বিস্তৃত বর্ণনা এই অল্প পরিসরে সম্ভবপর নহে। তবে নিম্নে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হইল ঃ

১। রোযার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল আল্লাহ্'র উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন। রোযাদার ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্'র প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস জন্মায় এবং আল্লাহ্'র প্রেমে তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহপাক সর্বশক্তিমান, সর্বপরিজ্ঞাত এবং সর্বস্থানে বিরাজিত। তিনি বিচারের দিনের মালিক। এই বিশ্বাস নিয়া রোযাদার একমাত্র আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সকল ক্ষুধা, পিপাসা, কাম, ক্রোধ, লোভ ও লালসা ইত্যাদি দমনপূর্বক রোযা রাখে।

২। চরিত্র সংশোধন রোযার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। রোযা মানুষের ভিতর ও বাহির উভয় দিকের সংশোধনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। মানুষের বাতেন বা ভিতরের অবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া নূরান্বিত করা এবং তাহার স্বভাবকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা রোযার মাধ্যমেই সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে রোযা মানুষকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। আর ইহা ক্বলবের বিশুদ্ধতার দ্বারাই হইতে পারে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

মনোযোগের সহিত শোন ! শরীরের মধ্যে একটি গোশ্তপিণ্ড রহিয়াছে, যতক্ষণ উহা ভাল থাকিবে, সমস্ত দেহ ভাল থাকিবে, আর যখন উহা বিগড়াইয়া যাইবে, তখন সমস্ত দেহ বিগড়াইয়া যাইবে। শুনিয়া রাখ ! উহা হইতেছে ক্বলব। ক্বলবকে সুস্থ রাখার পূর্ণ ব্যবস্থা রোযার মধ্যে রহিয়াছে। আর ক্বলবের অবস্থাকে পবিত্র ও নির্মল করিবার জন্য নামাযের পরই রোযার স্থান।

৩। সবর অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করা ইসলামের একটি বিশেষ আদর্শ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এই সম্পর্কে অগণিত প্রমাণ রহিয়াছে। এক হাদীসে সবরকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হইয়াছে। মুসলিম শরীফের হাদীসে সবরকে রূহানী আলো বলা হইয়াছে, আর রমযান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হইয়াছে। রোযা রাখার কারণে মানুষ নিজের নফসের যথেচ্ছাচারী অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে শেখে। রমযানের এই শিক্ষাকে ধৈর্যের শিক্ষা বলা হয়। কুরআনে পাকের ঘোষনা ঃ যাহারা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে পরিপূর্ণ পুণ্য প্রদান করেন।

৪। রমযানের আর একটি বৈশিষ্ট্য শোকর অর্থাৎ মানুষ আল্লাহপাকের অসংখ্য নেয়ামতের শোকর গোজারি বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে। আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য নিয়ামত বর্ধিত করিয়া দিব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি ভয়ঙ্কর। রোযা দ্বারা মানুষ কৃতজ্ঞ হইতে শিখে এবং আল্লাহ্পাকের হুকুমের ক্বদর ও ক্বীমত বুঝিতে পারে। এই প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণনা রহিয়াছে ঃ আল্লাহ্পাকের প্রদত্ত হেদায়েতের দরুন তোমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

আল্লাহ্ পাকের মহব্বতে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তোমরা উন্নত হইয়া যাও - হাদীস শরীফে এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে। তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্য, আমোদ-প্রমোদ ও ধন-মানের ব্যাপারে তোমাদের চাইতে নিম্নস্তরের ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ কর, তাহা হইলেই তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের ক্বদর করিবে।

বস্তুতঃ এই কারণেই ইফ্‌তারের সময় এই দোয়া পাঠ করিতে নির্দেশ রহিয়াছে ঃ হে খোদা ! আমি তোমার জন্যই রোযা রাখিয়াছি এবং তোমার দেওয়া খাদ্য দ্বারাই ইফতার করিতেছি। পিপাসা মিটিয়াছে। রগগুলি ঠাণ্ডা হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌'র নিকট পুণ্য নির্ধারিত হইয়াছে ইনশা-আল্লাহ্‌।

৫। রোযার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ইহা মানুষের মধ্যে পরস্পর স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, আন্তরিকতা ও সমবেদনা জন্মায়। হাদীসে পাকে আছে, যে ব্যক্তি রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করাইবে, তাহাকে রোযাদার ব্যক্তির সমান সওয়াব দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পেটভরে খানা খাওয়াইবে, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে হাউজে কাওছারের পানি পান করাইবেন। অতঃপর সে জান্নাতে এমতাবস্থায় প্রবেশ করিবে যে, হাশরের ময়দানে তাহার আর পিপাসাই লাগিবে না। আর যে কেহ তাহার কর্মচারীদের সাথে নম্র ব্যবহার করিবে, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দান করিবেন।

৬। রোযার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্‌পাক নিজ হাতে রোযার পুণ্য প্রদান করার সুসংবাদ দিয়াছেন। ইসলামে নির্ধারিত প্রত্যেকটি ইবাদতই একমাত্র আল্লাহ্‌'র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হইয়া থাকে। রোযার মাধ্যমেও মানবকুল আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালায়। মানুষ যেহেতু তাঁহার সমস্ত কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করত বিভিন্ন যাতনা সহ্য করিয়া আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় রোযা রাখে এবং ধৈর্যের সহিত সমস্ত কষ্ট সহ্য করে, তাই সে উক্ত সৌভাগ্যের যোগ্য অবশ্যই হইতে পারে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌পাক বলেন, মানুষের প্রত্যেকটি কাজই তাহার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা একমাত্র আমার (আল্লাহ্‌'র) জন্য। অতএব আমিই (আল্লাহ্‌ই) রোযার পুণ্য প্রদান করিব।

রাসূলে পাক (সাঃ) বলিয়াছেন, রোযা মানবের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। তাই যখন তোমাদের রোযার সময় হয়, তখন অশ্লীল কথাবার্তা বলিও না, অনর্থক কথা বলিও না। যদি কেহ গালি-গালাজ বা ঝগড়া করে, তবে তাহাকে বলিয়া দাও, 'ভাই আমি রোযা রাখিয়াছি।' 'ঐ খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁর হস্তে আমার জীবন, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ মেশ্‌কে আম্বরের সুগন্ধি হইতেও আল্লাহ্‌'র নিকট অধিক প্রিয়। রোযাদারের জন্য দুইটি খুশির সময়, একটি ইফতারের মুহূর্তে, অপরটি প্রভুর সহিত তাহার যখন সাক্ষাৎ হইবে।'

অপর এক হাদীসে কুদসীতে রহিয়াছে- আল্লাহ্‌ পাক বলেন, বান্দা খাদ্য, পানীয়, শাহওয়াত (কামনা) সব কিছুই আমার সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে। তাই রোযা আমার জন্য, সুতরাং আমিই রোযার বিনিময় প্রদান করিব।

মুসলিম শরীফে আছে, বান্দার নেকী দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু রোযা সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক বলেন যে, রোযা আমার জন্য, অতএব আমিই রোযার বদলা প্রদান করিব। বান্দা নিজের খাওয়া-দাওয়া, কামনার বস্তু ও খাহেশাত একমাত্র আমার জন্যই পরিত্যাগ করিয়াছে। রোযাদার ব্যক্তির জন্য দুইটি খুশির সময় একটি ইফতারের সময়, অপরটি আল্লাহ্‌'র সহিত তাহার সাক্ষাতের সময়। রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌'র নিকট মেশকে আম্বরের সুগন্ধি হইতে অধিক পছন্দনীয়।

এই দুইটি হাদীসের বিষয়বস্তু এক। ইহা হইতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, রোযাদারের সহিত আল্লাহ্‌পাকের সম্পর্ক কিরূপ হইবে এবং কি কারণে তিনি রোযার পুণ্য স্বয়ং নিজেই প্রদান করিবেন। এইখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। রোযাদারকে আল্লাহ্‌পাক নিজ হস্তে বদলা প্রদান করিবেন- ইহার অর্থ কি ? নেক কাজের বদলা প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কিছু নিয়মাবলী রহিয়াছে। আল্লাহ্‌পাক মানুষের অবস্থা ও আমলের একাগ্রতার দিকে লক্ষ্য করিয়া এক এক নেকীর বদলা দশ হইতে সাত শত বা তারও বেশি বাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু রোযা উক্ত নিয়ম হইতে মুক্ত। অতএব আল্লাহ্‌পাক নিজ হস্তে রোযার অপরিসীম বদলা প্রদান করিবেন।

রোযার উপকারিতা

রোযার উপকারিতা সম্পর্কে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মানুষের প্রবৃত্তির উপর আকলের পরিপূর্ণ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় মানবীয় দুর্বলতার কারণে প্রবৃত্তি মানুষের আকলের উপর প্রবল হইয়া উঠে এবং আকলকে কাবু করিয়া ফেলে। এই কারণেই প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে আল্লাহ্পাক রোযাকে মানুষের জন্য মৌলিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। তাই যাহারা রোযা পালন করে, তাহাদের ভাগ্যে নিম্নোক্ত উপকারিতা লাভ হয় ঃ

(১) রোযার দ্বারা প্রবৃত্তির উপর আকলের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়।

(২) রোযার দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্'র ভয়-ভীতি ও তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়।

(৩) রোযার দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও মিনতি সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্'র মহত্ত্ব ও কুদরতের অনুভূতি জাগে।

(৪) রোযার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়।

(৫) রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে দূরদর্শিতা জন্ম হয়।

(৬) রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে এক প্রকার রূহানী শক্তি সৃষ্টি হয়, যাহার দ্বারা মানুষ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

(৭) রোযার বরকতে মানুষ অসভ্যতা ও পশুত্বের স্বভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

(৮) রোযার বরকতে ফেরেশতাদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হয়।

(৯) রোযার কারণে আল্লাহ্'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হয়।

(১০) রোযার বরকতে মানুষের ভিতর ভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা, মায়া-মমতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা, যে কোন দিন ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত হয় নাই, সে কি করিয়া ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ব্যক্তির অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবে ? সে কেমন করিয়া রিযিকদাতার নেয়ামতের প্রকৃত শুকরিয়া আদায় করিতে সক্ষম হইবে ? হইতে পারে এমন ব্যক্তি মুখে মুখে আল্লাহ্'র শুকরিয়া আদায় করিবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুধা আর পিপাসার যন্ত্রণা না দেখা দেয় এবং শরীরের শিরা-উপশিরায় দূর্বলতা প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ পাকের নেয়ামতের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে না। প্রেমাস্পদ কিছুদিন দূরে থাকিলেই তাহার গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ হয়।

(১১) রোযার দ্বারা শারীরিক সুস্থতা লাভ হয়। অল্পখাদ্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে শারীরিক সুস্থতার মহৌষধ। আর আধ্যাত্মিক মনীষীদের মতে ইহা অন্তরের পরিশুদ্ধির উত্তম তরীকা।

(১২) রোযা মানুষের জন্য রূহানী খাদ্যতুল্য, এই খাদ্য পরকালে কাজে লাগিবে। যে ব্যক্তি এই খাদ্যকে সাথে নিয়া মৃত্যুবরণ করিতে পারিবে না, সে পরকালে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকিবে। সেইখানে সে অত্যধিক দুর্ভিক্ষে নিপতিত হইবে। কেননা, সে তাহার খাদ্যসামগ্রী সাথে করিয়া নিয়া যায় নাই। পৃথিবীতে যাহারা মানুষকে খাদ্যসামগ্রী দান করিল এবং প্রতিপালকের নির্দেশে পানাহার বর্জন করিল, পরকালে ইহার পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে আরো অধিক সামগ্রী তাহারা লাভ করিবে।

রোযা পালন করা আল্লাহ্'র প্রতি গভীর প্রেমের নিদর্শন। কেননা, কারো প্রতি ভালোবাসা ও প্রেম জন্মিলে তাহাকে লাভ করিবার জন্য প্রয়োজনে প্রেমিক পানাহার বর্জন করিয়া থাকে এবং স্ত্রীর সম্পর্কও ভুলিয়া যায়। ঠিক

তেমনিভাবে রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহ্'র প্রেমে মত্ত হইয়া সবকিছুই ভুলিয়া পানাহার বর্জন করিয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য রোযা পালন করা জায়েয নহে।

রোযার আধ্যাত্মিক বরকতসমূহ

১। গাফলত হইতে মুক্তি ঃ গাফলত অর্থ অলসতা। আল্লাহ্পাক মানবকে ফিত্রতে সালীম অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার গঠন প্রকৃতিতে দুই প্রকার শক্তির প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন; একটি মালাকুতী শক্তি, অপরটি হাইওয়ানী শক্তি। রোযা মানুষকে আল্লাহ্'র পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার সামর্থ্য প্রদান করে এবং এতে মাশুফী স্বাদ অর্জন হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে এমন একটি নূরানী শক্তি, যে শক্তির আলোকে মানুষের সমস্ত গোমরাহী বিদূরিত হয় এবং আল্লাহ্'র সহিত সম্পর্ক পয়দা হয়। আর হাইওয়ানী শক্তি নফসে আম্মারার শক্তি, সমস্ত খাহেশাতের শক্তি, ভোগ ও লিপ্সার শক্তি। যখন প্রথম শক্তির উপর দ্বিতীয় শক্তি প্রভাব বিস্তার করে, তখন মালাকুতী শক্তি পরাভূত হয়। প্রভুকে ভুলিয়া গিয়া ধ্বংসের দিকে ধাবমান হয়।

এই গাফ্লত হইতে মুক্তিলাভের বহু রাস্তা রহিয়াছে। তন্মধ্যে রোযা হইল উৎকৃষ্টতম পন্থা এবং রূহানী রোগের উত্তম চিকিৎসা। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামে রোযার শর্তাবলী সহজ এবং স্বাভাবিক বিধায় এই ধর্মে রোযা সার্বজনীন মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

২। নফসে আম্মারা ঃ ইহা প্রত্যেকটি মানুষকে অন্যায় ও খারাবির দিকে টানিয়া নিয়া যায় এবং মানুষকে ধ্বংসোন্মুখ করিয়া তোলে। তাই দেখা যায়, আমরা সকলেই অতি সহজে নফসে আম্মারার শিকারে পরিণত হইয়া যাই। এই কারণে অন্যান্য ধর্মেও নফসে আম্মারাকে সমূলে নিপাত করার প্রয়াস রহিয়াছে। কিন্তু যেহেতু ইসলাম স্বভাবগত ধর্ম, সেইহেতু এইখানে নফসে আম্মারাকে সমূলে নিপাত করার কোন হুকুম নাই। ইসলামের মতে মানুষ যুহদের (সাধনার) মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নফসে আম্মারাকে পরাভূত করিবে। এইখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, নফসে আম্মারাকে সাধনার মাধ্যমে পরাভূত করা, সমূলে নিপাত করা হইতে অধিক কষ্টসাধ্য এবং কঠিন কাজ।

মাওলানা মাহ্মূদুল হাসান
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
খতীব, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন- আমার বান্দাদের মধ্যে তারাই আমার নিকট সবচাইতে বেশি প্রিয়, যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে। (তিরমিযি)]

ZIKRULLAH

The remembrance of Allah (Subhanahu Wataala: SWT), which is Zikrullah in Arabic, is a very comprehensive concept of serving (Ibadah) Allah (SWT). It means and includes practically everything that a Muslim believes, thinks, meditates, practices, does and loves, as long as all these are related to the services men owe to Allah (SWT). In a holistic sense Zikrullah covers all the aspects of Imaan, Ilm and Aamal.

Zikrullah does not pertain to the un-believers. Those who do not believe in Allah (SWT) i.e. the Kaferun, obviously do not recognize Allah (SWT). Consequently, a non-believer (a kafer) does not remember Allah (SWT), the Creator, the Sustainer and the Lord of the Day of Judgement. Some of those who profess to believe also fail to remember Allah (SWT), most of the time, in their thoughts, deeds and dealings with other creations of Allah (SWT). Addressing these neglect-prone believers, Allah (SWT) warns: "And be not like those who forgot Allah, and He made them forget themselves. Such are the rebellious transgressors (Fasequn). [Surah Al-Hashr. Ayat 19]

Allah (SWT) will not remember the Fasequn in His special grace, mercy and love. Without the protection and support of basic level of grace, mercy and benediction from Allah (SWT) nothing or no being can exist or survive in this world, and for that matter in the entire universe. But the special grace and love of Allah (SWT) would be another dimension of divine mercy with which the Kaferun and the Fasequn will not be blessed.

Allah (SWT) special grace, mercy and love will be the cardinal factors of deliverance on the Day of Judgement. The transgressors (Fasequn) and the non-believers (Kaferun) will not merit these special blessings on that dreadful Day. The universal grace of Allah (SWT) is showered on all people, believers and non-believers alike, before they meet their mortal destiny. Those who remember Allah (SWT) may merit the very special grace, mercy and forgiveness of Allah and will be able to carry these precious spiritual dividends to the transcendental world beyond the horizon of death.

The concept of remembrance of Allah (SWT) or Zikrullah is a very inclusive and comprehensive one. Islamic scholars and saints have visualized Zikrullah in the light of their respective level of knowledge, religious experience and spiritual enlightenment.

Those who depend more on knowledge acquired from study of books tend to define Zikrullah in a more literal sense. According to the understanding of this school, Zikrullah is a product of normal perceptive faculties. Tasbih (recitation of Subhan allah), Tahlil (recitation of La Ilaha Illallah), and Tahmid (recitation of Alhamdulillah) are the usual forms of Zikrullah.

Chanting these important expressions are useful even if the mind and soul do not become deeply involved and engrossed in the sublime aspects of Zikrullah.

The Sufis and saints, who are the denizens of supreme spiritual domain, tend to depend more on knowledge conferred on them as a special divine grace from Allah (SWT). Acquired knowledge is surpassed in degree of excellence by the direct divine knowledge specially gifted by Allah (SWT) in His infinite mercy. The Prophets were the highest level of beneficiaries of this spiritual knowledge. Some Sufis and saints also receive a measure of this divine gift of knowledge. In the light of this special endowment of conferred knowledge the Prophets invite humanity towards Zikrullah. The Sufis and saints attain a sublime perception of Zikrullah in the context of his received knowledge. For them the entire space of their spiritual awareness and divine consciousness get absolutely permeated by a very high level of ardent love for Allah (SWT). Hence the light of abiding love for Allah (SWT) emanates out of their ultimate expression of Zikrullah.

The enthralling spiritual adventure into the magnificent world of Zikrullah starts with Imaan. Unqualified and unswerving faith in Allah, His Absolute Unity, His Supreme Divinity and His All Pervasive Power becomes the most precious asset of traveler in the path of Zikrullah. The stronger the Imaan, the more secure is the solitary traveler in the path of spiritual advancement. Imaan becomes both a means as well as an end for devout seeker of love of the Creator and the Master of the Day of Judgement. Zikrullah is not only the cause but also the effect of progressively higher levels of Imaan reached by a devotee of Allah (SWT) as he patiently struggles along the path of spiritual attainments. Unfortunately this glorious path is less traveled.

'Salat' is the next best manifestation of Zikrullah. Allah (SWT) says, "… and establish regular prayer for My remembrance". [Surah Ta Ha, Ayat 14]. 'Salat' is the second best manifestation of remembrance (Zikr) of Allah (SWT), after Imaan. It signifies an intense personal communion of the believing soul with the Lord and the Master. The singular importance of prayer (salat) has been emphasized as many as eighty two (82) times in the Holy Quran. In Surah Ankabut at Ayat 45, Allah's (SWT)

commandment is very emphatic, "… establish regular prayer (salat), for 'Salat' restrains from shameful deeds, and remembrance of Allah is the greatest (thing of life) without doubt …"

Allah (SWT) in His infinite mercy has ordained a divine right of the poor in the surplus wealth of a rich believer. When the devout believer discharges his obligations relating to Zakat and delivers the share of the poor to the poor, the believer accomplishes the duty ordained by Allah (SWT). In the act of paying Zakat, the believer remembers Allah (SWT) and the duty

enjoined by Allah (SWT) relating to purification of wealth. Zakat thus becomes yet another significant means of remembrance of Allah (SWT).

For the sake of Allah (SWT), a believer abstains from food, drinks and some otherwise halal (permissible under Sharia law) activities of life during the day time. This is 'Siam' (formal abstention), which is much more than mere fasting. Doing ones duty to Allah (SWT) is an important expression of Zikrullah. 'Siam' is among the noblest form of remembrance of Allah (SWT). The soul gets sanctified and purified through the discipline-bound exercise of Siam. The remembrance of Allah (SWT) is specially highlighted during the month of Ramadan through Siam and Salatul Tarabih.

"I am here, Allah I am here. I am here. There is no partner with you. I am here. Certainly belong to you all praises, all goodness and all powers. There is no partner with you," so chant the Hajis during the performance of Hajj. The believers throug the blessed valley of Arafat and seek the grace, mercy and forgiveness of Allah (SWT) through day-long prayers. Hajj is thus a beautiful act of remembrance of Allah (SWT).

In addition to these obligatory forms of remembrance of Allah (SWT), the devout believers remember Allah (SWT) in all their thoughts, deeds and meditations. "They (the people with wisdom) remember Allah, while they are standing, sitting and lying." [Surah Al-Imran, Ayat 191]. This comprehensive remembrance of Allah (SWT) manifests itself in all the worldly activities of a believer. He remains very conscious about the commandments of Allah (SWT) when baser instincts to lie, to rob, to short-change in a deal, to betray on promises, and to break a trust etc. try to subsume his sense of propriety, goodness and sense of justice. He prays for help from Allah (SWT) to protect himself against the onslaught of baser forces within himself. He fears Allah (SWT) and hopes for Allah's (SWT) mercy and help. The believer refrains from doing things forbidden by

Allah (SWT). He helps the creations of Allah (SWT) for the sake of Allah (SWT). This is the true significance of genuine Zikrullah in the context of mundane world and the instinctive incitements of greed, hatred, vengeance and violence.

"Remember Me, I will remember you". [Surah Al-Baquarah Ayat 152], so reassures Allah (SWT) the true believers. Allah (SWT) offers special grace and succor to the practicing believers. Way laid by fear, anger and kufur, the believer remembers Allah (SWT) for help and deliverance against the enticements of Nafs-e-Ammara (the baser soul surfeited with animal instincts). Allah (SWT) holds out the hope of His special help and grace in the struggle (Jihad) of the devout believer against the baser elements in him. In this respect Jihad against all wrongs and denial of justice becomes a novel form of Zikrullah.

The believers are exhorted to sincerely remember Allah (SWT) in their prayers, in their Istigfars (seeking forgiveness of Allah), in their dealings with other creations including fellow human beings, in managing their own life, physical, mental and spiritual and in their innermost reflections. Allah (SWT) reconfirms, He will remember these devout believers in the dispensation of His special grace, mercy, help and forgiveness. Thus remembrance of Allah (SWT) i.e. Zikrullah, is elevated to a quintessential level of spiritual accomplishment. "Remember Allah as much as you can." [Surah Ahzab, Ayat 41] so admonishes Allah (SWT) the believers.

Reciting the Holy Quran is one of the best ways of remembering Allah (SWT). Knowing the divine message of Allah (SWT), understanding its meanings, reflecting on the significances of the eternal message and above all translating Allah's (SWT) commandments in terms of real life practices, doing what Allah (SWT) commands to do and to refrain from what Allah (SWT) forbids, all these collectively and individually constitute practical manifestations (i.e. Amaal) of Zikrullah. Just chanting the name and divine attributes of Allah (SWT) would be a mere lip service, unless the believer puts into practice what Allah (SWT) ordains either through the Holy Quran or through the Holy Prophet (Sallallahu Alaihe Wa Sallam: SAWS).

Zikrullah is the most important factor for spiritual empowerment of the Soul. The soul is created with the intrinsic nature of yearning for the proximity and grace of Allah (SWT). "for without doubt in the remembrance of Allah do souls final satisfaction". [Surah Al-Raad. Ayat 28]. Sincere remembrance of Allah (SWT) is the ultimate essence

of all devotional services (Ibadaat) of a believer. Devout remembrance of Allah (SWT) ennobles the inner spiritual experience of the believer and elevates the 'Nafs' (Soul) to the highest level of 'Nafs-e-Mutmainna' (the soul at divine level of contentment and holy bliss). At his ultimate state of spiritual advancement the 'Nafs-e-Mutmainna' is invited to the abode of perpetual peace and divine bliss, "O (thou) soul in (complete) rest and satisfaction ! come back thou to thy Lord well pleased (thyself) and well-pleasing into Him. Enter thou, then, among My devotees, yea enter My Heaven." [Surah Al-Fajr. Ayat 27-30]. May Allah (SWT) grant us the level of Imaan, knowledge (Ilm) and Ammal (religious practice), so that we can merit Allah's (SWT) special grace, mercy and forgiveness through Zikrullah.

Mufleh R. Osmany
Former Ambassador, Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Govt. of Bangladesh
Member, Executive Committee, Gulshan Central Masjid & Iddgah Society.

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রসঙ্গ, মধ্যপন্থা, জেহাদ ও রেনেসাঁ

আল্লাহপাক স্বয়ং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সূরা আল ইমরানের ১১০ নং আয়াত দ্বারা ঘোষণা করেছেন ঃ "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত-মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে"। "শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়" ঘোষণা করার কারণসমূহ কুরআনে একাধিক আয়াতে বর্ণিতও হয়েছে। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য আয়াত সূরা বাকারায় এসেছে। যেখানে আয়াতের ব্যাখ্যায় - মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপন্থার পূর্ণ বিবরণও সেখানে প্রদত্ত হয়েছে। (সূত্র-মারেফুল কুরআন-১ম খণ্ড) "ওয়াকাজালিকা জাআলনাকুম উম্মাতাও ওয়াসাতা" অর্থাৎ "এমনিভাবে আমি তোমাদিগকে (মুসলমানদেরকে) মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি"। (সূরা বাকারা-১৪৩) জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যম সুষম পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছে। আর এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথ, আর এ পথের বিপরীত যত মত তার সবই গজবে পতিত। মুসলিম উম্মাহকে হতে হবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার পথিক। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সবদিক থেকেই মধ্যপন্থীর শ্রেষ্ঠতম মডেল। কস্মিনকালেও তিনি উগ্রপন্থী ছিলেন না-এবং প্রয়োজনে নরমপন্থাও আঁকড়ে থাকেন নি। তিনি বলেছেন ঃ "মধ্যপন্থীরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত জ্ঞানের পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে। রক্ষা করবে জ্ঞানকে অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির হাত থেকে"। নবীজীর (সাঃ) শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি-বিসর্জন দিয়েছি জ্ঞান অর্জনকে। অথচ কুরআনের প্রথম শব্দ হিসেবে নাজিল হয়েছে "ইকরা" অর্থাৎ পড় (জ্ঞান অর্জন কর)। ইতিহাস সাক্ষী-সপ্তম শতক থেকে প্রায় ১০০০ বছর ইসলামই দুনিয়ায় জ্ঞানের ভাণ্ডার বিলিয়েছে। প্রতিষ্ঠা করেছে রাষ্ট্রাচার-মানবিক যুদ্ধনীতি ও কল্যাণমুখী সংবিধান। জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাষ্ট্র-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি- চিকিৎসা-জীবন-আচরণ-পদ্ধতি সব কিছুতেই মুসলিম মনীষীরা অবদান রেখে গেছেন। কয়েক লক্ষ পৃষ্ঠার চিকিৎসা সংক্রান্ত থিসিস যা ইবনে সিনা প্রণয়ন করেছিলেন-তা কি বিশ্ব আজও পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পেরেছে ? শূন্যের (০) আবিষ্কার ও এর প্রয়োগে গণিতে যে বিপ্লব তা কি মুসলিম মনীষার দ্বারা হয়নি ? 'এলজাবরা' (বীজগণিত) আবিষ্কার কে করল ? পৃথিবীর যে মানচিত্র মুসলিম জ্যোতির্বিদরা প্রণয়ন করেছিলেন- তা কি আজও চালু নেই- কোন ভুল কি ধরা পড়েছে ?

পশ্চিমা মিডিয়া থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সকল পাত্র-মিত্ররা আজ সবচেয়ে বেশি মতাদর্শিক আক্রমণ তথা অপপ্রচার চালাচ্ছে জেহাদের বিরুদ্ধে। কেননা, গবেষণায় তারা দেখেছে যে এটা ইসলামের এক অন্তর্নিহিত শক্তি। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে "জেহাদ ফরজ" (বুখারী)। জেহাদ বা সংগ্রাম-সর্বাগ্রে নিজের রিপুর বিরুদ্ধে-নফসের বা মনের অসৎ চাওয়া-পাওয়ার বিরুদ্ধেই মুসলমানকে করতে হয় নিরন্তরভাবে এবং এটা একটা ইবাদত। যার তাগিদ বারবার এসেছে কুরআন মজিদে ও হাদীসে পাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে জিহাদ হলো অবিচারের বিরুদ্ধে এক ন্যায় যুদ্ধ এবং মূলত কোন নির্দিষ্ট-ভূখণ্ডের অথবা সংঘবদ্ধ কোন জাতি-গোষ্ঠীর স্বীকৃত নেতার তরফে জিহাদের ঘোষণা আসতে হয়। কোন প্রান্তিক দলের কাছ থেকে এ ঘোষণা আসতে পারে না। মহানবী (সাঃ) পীড়নের কঠিনতম দিনগুলোতেও মক্কায় অস্ত্র তুলে নেননি। বরং হিজরত করে অন্য শহর-মদীনায় চলে গেছেন। কিন্তু তারপরেও কাফেরগণ আক্রমণ বন্ধ রাখেনি। এভাবে বিশ্বাসীদের জীবন যখন বিপন্ন এবং সর্বোপরি যখন একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের টিকে থাকার প্রশ্ন এলো - ঠিক তখনই গৃহীত হলো সশস্ত্র পন্থা। আসলে যুদ্ধ বিষয়ক আয়াত তখনই নাজিল হলো-যখন বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য নির্যাতনের পথ কাফেররা বেছে নিয়েছিল। মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবীগণ বাধ্য হয়ে অস্ত্র তুলে নেন। তদুপরি সেই দেড় হাজার বছর আগে জিহাদ বিষয়ে যেসব বিধান প্রণীত হয়েছিল, সভ্যতা তথা মানবতার বিচারে আজও তা কেউ

অতিক্রম করতে পারেনি। জেহাদেই প্রথম স্পষ্টভাবে নারী-শিশু-বৃদ্ধ এবং নিষ্পাপদের হত্যা না করার বিধান জারি হলো। এমনকি ফলজ গাছ পর্যন্ত ধ্বংস করা যাবে না বলে নির্দেশ এলো। ইতিহাস সাক্ষী ঃ প্রতিটি জিহাদ মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধই জিহাদ নয়। খ্রীস্টানদের ধর্মযুদ্ধ যা-ক্রুসেড হিসেবে পরিচিত-তা বরাবরই "বর্বর ধর্ম হিসেবে ইসলামকে" তুলে ধরতে জিহাদকে সামনে নিয়ে আসে।

ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা জানি, ফ্রেডরিক (১১২৩-১১৯০) যখন ক্রুসেডের সূচনা ঘটালেন তখন মিসরের মুসলিম শাসনকর্তা (সুলতান) তাকে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একটি ঘড়ি (এস্ট্রোনমিক্যাল) উপহার দিয়েছিলেন। আর এই ঘড়িটিই খুলে দিল ইউরোপের জ্ঞানের দ্বার। অনাবিষ্কৃত-শীতার্ত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত এক আধা সামন্ত-আধা দাস ভিত্তিক মূল্যবোধের ইউরোপে তখনও পর্যন্ত না রচিত হয়েছিল কোন কালজয়ী সাহিত্য, না ছিল বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান-না ছিল জনগণের কোন মৌলিক অধিকার। এমনকি না ছিল ইউরোপে কোন ভদ্রজনোচিত খাদ্যাভ্যাস তথা মর্যাদাকর জীবন যাপন প্রণালী। এভাবেই এক সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী মহান উত্থানের ঊষালগ্নে সূচিত হলো ইউরোপীয় রেনেসাঁ। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা- জাতীয়তাবাদ ইত্যকার সব বৈপ্লবিক চেতনা প্রবেশ করল জন মানসে। কূপমণ্ডূক খ্রিস্টীয় পাদ্রী তন্ত্রের হাজার বছরের শৃঙ্খল আর বিবেকহীন সামন্ত ভূস্বামীদের পীড়নমূলক শোষণ যন্ত্রটিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁর জোয়ারে ভাসিয়ে নিল কালজয়ী সাহিত্য ও জনমানসের উন্নত সাংস্কৃতিক কৃষ্টি। আর সমগ্র এ উত্থানটি মাত্র ৬০০ বছর আগের। স্বপ্নের ও স্বাদের আমেরিকা ১৪৯২ তখনও অনাবিষ্কৃত-রাণী ইসাবেলা ও কলম্বাস কেউ জন্মই নেননি। কেবল ভাইকিং নাবিকেরা মাঝে মধ্যে আতলান্তিক পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করে আমেরিকার আদি মালিক রেড ইন্ডিয়ানদের না-হক কষ্ট দিত। অথচ প্রায়শই আমাদের শুনতে হয় এমনকি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও নাক সিঁটকান-ইসলামে কোন রেনেসাঁর পর্ব নেই। সবিনয়ে জানাই, রেনেসাঁর আপনাদের দরকার হবে তখনই-যখন একটি অন্ধকার যুগ আপনি পেরিয়ে আসবেন। অন্ধকার থাকলেই তো আলোর প্রয়োজনীয়তা। সুসভ্য ফ্রান্স আর ঐতিহ্যবাহী ইংল্যান্ডে যখন একটি মাত্র স্কুলও চালু হয়নি তখনও (হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিচর্যায় বেড়ে উঠা আর হযরত আবদুল্লাহ-ইবনে-মাসউদ (রাঃ) ও ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) থেকে বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) সহ অসংখ্য মুসলিম মনীষার পদস্পর্শে ধন্য) বাগদাদে ছিল শত শত বইয়ের দোকান আর লাইব্রেরি। বলা হয়, মঙ্গলরা যখন বাগদাদ ধ্বংস করেছিল টাইগ্রিস নদীর অর্ধেক লাল হয়ে গিয়েছিল মুসলমানদের পবিত্র রক্তে-আর বাকি অর্ধেক বইয়ের কালো কালিতে।

১৪০০ বছরেরও বেশি ইসলামের বয়স-আর গণতন্ত্র তার সহজাত অন্য মূল্যবোধগুলো নিয়ে এ পর্যায়ে এলো মাত্র বিংশ শতাব্দীতে। যুগ যুগ ধরে ইসলাম শান্তির সব শর্ত পূরণ করেছে। সভ্যতা নির্মাণ করতে সর্বোচ্চ মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করেছে গাজী সালাহউদ্দিন আর মহাবীর তারেকরা। তরবারীর ডগায় ইসলাম বিকশিত হয়নি। যদি সত্যি তাই হতো-আজকের স্পেনে কোন খ্রিস্টান থাকত না। ককেসাস অঞ্চলজুড়ে প্রায় ৮০০ বছরের মুসলিম শাসনে ইহুদিদের বিস্তার ঘটতো না। ইসলাম জবরদস্তি বরদাশত করে না (বাকারা-২৫৬)। জিজিয়া করের বিধান এনে বিধর্মীদের সাথে সহাবস্থানের নীতি ইসলাম কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়েছিল। ইসলামের সমূহ শাশ্বত সত্যের বৈপ্লবিক অনিবার্য উত্থানে ভীত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিকশিত নতুন বিশ্বমতবাদ- পুঁজিতন্ত্র নতুন আঙ্গিকে-নবতর কৌশলে ইসলামের সাথে মতাদর্শিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। খ্রিস্টীয় ক্রুসেড সামন্তবাদের ফসল ছিল পুঁজিবাদের বৈপ্লবিক উত্থানের বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর পুঁজিবাদ যখন গায়ে-গতরে আরো বৃদ্ধি পেয়ে সভ্য-সংস্কৃতিমনা হয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে ও পর্বে প্রবেশ করল (যেটাকে-কাল মার্কস ও ভ.ই.লেলিন-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন) তখনই শুরু হলো ধর্মের বিরুদ্ধে এক অপ্রকাশ্য যুদ্ধ। সামন্ততন্ত্র ও তার জাতিভাই

পাদ্রীতন্ত্র অর্থাৎ সামন্ত রাজা ও ভূস্বামী এবং চার্চের পাদ্রীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পুঁজিবাদ ইউরোপে নিয়ে এসছিল রেনেসাঁ-যার প্রয়োজনীয়তা ছিল ইতিহাস নির্ধারিত। ইউরোপের রেনেসাঁর বহু শতাব্দী আগেই ইসলাম দুনিয়ায় আলো (রেনেসাঁ) নিয়ে এসেছিল সেই সপ্তম শতকেই। তবে এটাই ধ্রুবসত্য যে-দাসযুগে সূচিত নবুয়তের (৬১০ ঈসায়ী সালকে ধরে) মহান ইসলাম শৃঙ্খলের সকল শেকলই শুধু ভাঙ্গেনি-দুনিয়া জুড়ে নিয়ে এসেছিল শিক্ষার মূল মর্মবাণী-রাষ্ট্র পরিচালনার ১ম নীতিমালা-সমাজ গঠনের সুকৌশল-ব্যবস্থাপনা-এমনকি ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সকল আচার-পদ্ধতি- লেনদেন-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কাঙ্ক্ষিত সব মডেল। এদিকে পুঁজিবাদেরই গর্ভে মাত্র শ'খানেক বছর আগে জন্ম নিল আরেক বিপ্লবী শিশু যার নাম-সমাজতন্ত্র।

ধর্ম প্রসঙ্গে যার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আরো দু'ধাপ নেতিবাচক। তখন পুঁজিতন্ত্র তথা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্র স্বার্থক এক কৌশল গ্রহণ করল। ইসলামের সাথে মতাদর্শিক সংগ্রামটা সমাজতন্ত্রের সাথে লাগিয়ে দিল-আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে ইসলামের বৈপ্লবিক উত্থানকে দাবিয়ে রাখার জন্য দুনিয়ার দেশে-দেশে মুসলিম রাজন্য ও স্বৈরাচারকে লাগাতার মদদ যোগাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমা এজেন্সিগুলো স্বয়ং বিপথগামী কিছু তরুণ র‍্যাডিক্যাল এবং কোথাও কোথাও হতাশাগ্রস্ত যুবগোষ্ঠী আর কোথাও শর্টকাট পথে "বেহেশতকামী স্বপ্নাভিসারীদের"-দূর থেকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে গড়ে তুললো তথাকথিত জঙ্গিচক্র-যাতে ইসলামকে "উগ্র" পশ্চাতমুখী বর্বর "হিংস্র" তাবতসব নেতিবাচক বিশেষণে বিভূষিত করা যায়। এদিকে নব্বইয়ের দশকে আকস্মিকভাবে সমাজতন্ত্রের পতন শুরু হয়ে গেলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বচক্র নিজেই সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। গোটা বিশ্ব পুঁজিচক্র-পারমাণবিক শক্তি ভাণ্ডারসহ নতুন যে মারণাস্ত্র নিয়ে আজ রণাঙ্গনে সমূর্তিতে আবির্ভূত তার আরেক নাম মিডিয়া। যার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ-পৃথিবীর সবচেয়ে সংখ্যালঘু অথচ সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি-ইহুদিদের কব্জায়। অল্প এ পরিসরে যার সম্পূর্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন অসম্ভব।

মুসলমানদের সামগ্রিকভাবে আজ এসকল তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে-উগ্রতা পরিহার করে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে-অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। ত্যাগ করতে হবে সব ধরনের-মূর্খতামূলক গোঁড়ামি। পাশাপাশি বর্জন করতে হবে আধুনিকতার নামে সব ধরনের পশ্চিমা অসভ্যতাকে। পাশাপাশি অর্জন করতে হবে আধুনিকতার ইতিবাচক নির্যাসকে। ইসলাম কোন কালের-সময়ের বা স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-সে শাশ্বত-সর্বাঙ্গীণ সত্য ও সামগ্রিকভাবে সুন্দরতম এক বিশ্ব ব্যবস্থা। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা-মহান রাব্বুল আলামীন-পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসের আদর্শতম মানুষ-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য যে জীবন ব্যবস্থা কুরআন-হাদীসের ভেতর রেখেছেন-কেবলমাত্র এবং একমাত্র তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করার মধ্যদিয়েই-মুসলমান মুক্তির কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে এবং দুনিয়ায়ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি। শান্তির এ শর্ত পূরণে সবচেয়ে বেশি আজ যা প্রয়োজন তা হলো আরো বেশি বেশি মেধা ও শ্রম দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত এক মধ্যম সুষম-ভারসাম্যপূর্ণ পন্থাকে জ্ঞান-গরিমা এবং জান-মাল দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। তুলে ধরা ইসলামের মধ্যপন্থার অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ।

এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, এক্সিম ব্যাংক, এফবিসিসিআই এবং সিডিবিএল
সেক্রেটারী জেনারেল, ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটি

আধুনিক জীবন ও ইসলাম

আধুনিক জীবন, আধুনিক যুগ বা আধুনিকতার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেয়া মোটেই সহজ নয়। আধুনিকতা একটি আপেক্ষিক ব্যাপারও বটে। একজনের নিকট যা আধুনিক অন্য জনের নিকট তা আধুনিক নাও হতে পারে। তবে প্রচলিত ও সাধারণ অর্থে আধুনিক বলতে পাশ্চাত্য জীবনধারা ও জীবন দর্শন প্রভাবিত জীবন ও যুগকেই বোঝানো হয়ে থাকে। রেনেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার এবং জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে মানুষের অবাধ বিচরণের ক্ষমতা অর্জন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের অসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ, নানা রকম দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভাবন ইত্যাদির প্রভাবে জীবন যে এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে তাই আধুনিক জীবন। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক জীবন হলো নিজেকে ও জগৎকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার নববলে বলীয়ান মানব জীবনের এক নতুন রূপ। রাজনৈতিক, আদর্শিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক তথা জীবনের সর্বস্তরে আধুনিকতার প্রভাব পরিব্যাপ্ত।

আধুনিক জীবনের সংজ্ঞায়ন কঠিন হলেও নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে জীবনের আধুনিক রূপকে উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে তথা ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের শাসন, মুক্ত চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার, মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা, জীবিকা অর্জনে সমান সুযোগ, ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ন, যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমের ব্যাপক উন্নতি, নতুন মূল্যবোধের জন্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতি, বিজ্ঞানমনস্কতা, গতিশীলতা, সহনশীলতা, প্রযুক্তিপ্রিয়তা ইত্যাদি। এসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি আধুনিক জীবনের অনেকগুলো নেতিবাচক দিকও রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

ধর্মনিরেপেক্ষতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, অর্থনৈতিক সুবিধাদি কুক্ষিগত ও শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি, উন্নত প্রচার মাধ্যমের অধিকারীদের হাতে দরিদ্র জনগণের বন্দিদশা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারের ভাঙ্গন, মুক্ত চিন্তার নামে অশ্লীলতার প্রসার, উন্নত প্রযুক্তির অপব্যবহারে মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া, জীবনের জটিলতা, অস্থিরতা, উত্তেজনা ও হতাশা ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে নতুন নতুন রোগের জন্ম ও নেশাগ্রস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, ভোগবাদী জীবন দর্শনের প্রসারের ফলে নানাবিধ মানবিক ও সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি ইত্যাদি। বস্তুত আধুনিকতার প্রচণ্ড শক্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী কোন বস্তুর অভাবে অনেক সময় এর ইতিবাচক দিকগুলোর তুলনায় নেতিবাচক দিকগুলো বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে। একমাত্র ইসলামই পারে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করতে। এখানেই ইসলাম ও আধুনিক জীবন বা আধুনিকতার মাঝে সম্পর্কের শুরু।

ইসলাম চির আধুনিক। ইসলাম জগতের সামনে যে জীবন দর্শন, জীবনবোধ ও জীবন পদ্ধতি পেশ করেছে তা চিরদিন মানুষকে আধুনিক জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আধুনিকতার মূল কথা হলো মানুষকে যাবতীয় বন্ধন ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে তাকে একটি অনুসন্ধিৎসু ও মুক্তমনের অধিকারী করে সৃষ্টি জগতের রহস্য উদঘাটন করে নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজের ও জগতের সবার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে তাকে উৎসাহিত করা। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত বলে ঘোষণা করে তাকে যাবতীয়

সৃষ্ট বস্তুর অধীনতা থেকে মুক্ত করে জগতের সব কিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সুন্দরভাবে জীবিকা অর্জন ও জীবন যাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। সুরা বনী ইসরাইলের ৭০ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

"আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাকে জলে স্থলে আধিপত্য দান করেছি, তার জন্য পবিত্র ও সুন্দর জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করেছি এবং জগতের অনেক কিছুর উপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছি।" ইসলামের এ আধুনিক জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমান আলেম ও বিজ্ঞানীগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অনেক বাণী তাঁদেরকে এ কাজে উৎসাহিত করেছে। সৃষ্টি জগতের রহস্য উদঘাটন করে আল্লাহ তায়ালার কুদরতী শক্তি অনুধাবন করা এবং এর মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করার জন্য পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে সরাসরি তাগিদ দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে জ্ঞান সাধনের কালিকে শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক যুগ ব্যাপী মুসলিম মনীষী ও বিজ্ঞানীদের সাধনার ফল নানাভাবে পাশ্চাত্য জগৎ কর্তৃক সমাদৃত হবার ফলেই সেখানে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও জীবনবোধের উন্মেষ ঘটে। অতএব আধুনিক জীবনের ভিত্তি মুসলমানদের হাতেই রচিত হয়। জ্ঞান সাধনে পরবর্তীতে পিছিয়ে পড়ার কারণে অনেক আপন বিষয়ও মুসলামনদের নিকট অপরিচিত মনে হয়। যত অপরিচিতই মনে হোক না কেন, ইসলামের কোন শিক্ষা যদি আধুনিক যুগে নতুন করে মুসলমানদের সামনে আসে তবে সেটা তাদের কাছে অবশ্যই সমাদৃত হওয়া উচিত। কেননা এটা তো আমাদেরই হারানো ধন যা আমরা ফিরে পেয়েছি। এক হাদীসে বলা হয়েছে, "জ্ঞান-বিজ্ঞান মোমেনের হারানো ধন, যেখানেই পাওয়া যাক না কেন তার যোগ্য অধিকারী হলো ঈমানদার মুসলিম।" এজন্যেই কোরআন ও হাদীস না হয়েও একথাটি মুসলিম সমাজে বহুল প্রচারিত যে জ্ঞানের অন্বেষণে প্রয়োজনে সুদূর চীনেও যেতে হবে।

তবে ইসলামী আধুনিকতা ও প্রচলিত বা পাশ্চাত্য আধুনিকতার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য আধুনিকতা মানুষকে যেখানে সীমাহীন, লাগামহীন ও উদ্দেশ্যহীন মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়ে তাকে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে ঠেলে দেয়-ইসলাম সেখানে মহান স্রষ্টার বিধি নিষেধ ও রাসূলে করীম (সা:) -এর আদর্শের অনুপম পরশ এবং মানুষের কল্যাণ সাধনের অকৃত্রিম ব্রতে মানুষের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা পরিণামে মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে ধ্বংস ডেকে আনে। পবিত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবায় মানুষকে সৃষ্ট জগতের যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্ ও রাসূলের নিয়ন্ত্রণে আনার অমোঘ বাণীই বিধৃত হয়েছে। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্" এর প্রকৃত তাৎপর্য এটাই।

পাশ্চাত্য ও আধুনিক জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোর বর্জন ও প্রতিরোধের সাথে সাথে এর ইতিবাচক দিকগুলো সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এর কোনটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর এবং ইসলামী মূল্য ও জীবনবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসবের অনেক দিক রয়েছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর, কল্যাণকর ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বলে মনে হলেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে এগুলো একটি বিশেষ পরিবেশ ও মূল্যবোধের আবেশে উদ্ভাবিত ও লালিত বলে আমাদের জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। এধরনের বিষয়গুলো হয় একেবারেই বর্জনীয়, নয়তো পরিশীলন ও পরিমার্জনের মাধমে গ্রহণীয়। এক সময় মনে করা হতো যে আধুনিক জীবনের আদর্শগত দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকলেও এর বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত দিকটা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আজ একথা প্রমাণিত সত্য যে আধুনিক প্রযুক্তির সবটুকুই বিনাদ্বিধায় গ্রহণীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তিও নানা বিবেচনায় আমাদের জন্য ক্ষতিকর। সে জন্য উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

অপব্যবহারের কারণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিও কেমন করে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় তার একটি উদাহরণ হলো অতি সম্প্রতি খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তক আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলোকে পাপাচারের হাতিয়ার রূপে বর্ণনা করা। এর অন্য একটি নজির হলো আধুনিক সর্বশেষ প্রযুক্তি ও মেধার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত মানবধ্বংসী মারণাস্ত্রসমূহকে অকল্যাণকর বিবেচনা করে সেগুলো ধ্বংস সাধনের জন্য পরাশক্তিসমূহের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত।

এ পর্যায়ে আধুনিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রয়েছে এমন সব বিষয়াদি যেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এসব বিষয়ে ইসলামী নীতিমালার আলোকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে এমন সব বিষয়াদি যেগুলোর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোন ইসলামী দিকনির্দেশনা নেই। এগুলো ইসলামী মৌলিক আকিদাহ বিশ্বাস, জীবন দর্শন এবং বৃহত্তর মানব কল্যাণের নিরিখে গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে।

আমাদের সমাজে আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণের পক্ষে যেমন কিছু লোক রয়েছে, তেমনি অকারণে এর বিরোধিতাকারী কিছু লোকও রয়েছে। অথচ সত্য ও কল্যাণের পথ হলো এ দু'য়ের মধ্যবর্তী। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে কোনটা আমাদের জন্যে কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর, এটা নির্বাচন করা ছাড়া অন্ধভাবে আধুনিকতার অনুকরণের পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক। এতে আধুনিকতার ইতিবাচক দিকগুলোর তুলনায় এর নেতিবাচক দিকগুলো বেশি করে আমাদের জীবন ও সমাজে অনুপ্রবেশ করে আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেবে। তাই প্রথমোক্ত দলের লোকদের একটু সংযত হওয়া উচিত ।

শেষোক্ত দলের লোকদের জন্য আমাদের নসিহত হলো এই যে সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে মাঝে মাঝে নতুন কোন পন্থা বা বস্তুকে আপন করে গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই দোষণীয় নয়, যদি তা আমাদের মৌলিক আক্বীদা, বিশ্বাসের পরিপন্থী না হয়। যুদ্ধে খন্দক বা পরীখা খনন করে আত্মরক্ষা করা সে যুগে একটি নতুন রীতি ছিল। কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মহানবী (স.) হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) এর পরামর্শে তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। আর খেজুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে মহানবী (স.) এর একটি পরামর্শ গ্রহণ করার ফলে উৎপাদন কম হলে তিনি বলেছিলেন যে এটা আমার নিজস্ব অভিমত ছিল। শরীয়তের কোন বিধান ছিল না। সুতরাং যে পদ্ধতিতে উৎপাদন বেশি হবে বলে তোমরা মনে কর সে পদ্ধতি তোমরা গ্রহণ করতে পার। "আনতুম আলামু বিউরি দুনয়াকুম" এসব সাংসারিক বিষয় তোমরাই ভালো বোঝ, এথেকে প্রমাণিত হলো যে, আক্বীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ কল্যাণকর যে কোন প্রযুক্তি গ্রহণে ইসলামী কোন বাধা নেই।

সুতরাং ইসলামী জীবন ও মূল্যবোধকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে মুক্ত বুদ্ধি, উদার চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার মাধ্যমে আধুনিক কল্যাণকর প্রযুক্তি ও কার্যধারা প্রয়োগ করে মুসলিম উম্মাহকে উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়াই আজকের সময়ের ডাক। এ ডাকে সাড়া দেয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। এপথেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের হারানো গৌরব আমরা ফিরে পেতে পারি। অন্যথায় পশ্চাৎপদতা, ব্যর্থতা, গ্লানি নিয়েই আমাদেরকে কঠোর জীবন যাপন করতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে গড়ার জন্য আল্লাহ্ পাকের যে নির্দেশ তা লংঘন করার অপরাধে অপরাধীও হতে হবে।

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- ক্ষুধায় অধীর হয় নাই এইরূপ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা সুন্নাত এবং ক্ষুধায় অধীর হইয়া গিয়াছে এইরূপ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা ফরজ সে যে কেহই হউক না। শত্রু হস্তে বন্দী মুসলমানের মুক্তির ব্যবস্থা করাও ফরজ। (বুখারী)]

বস্তুতঃ মুসলিম বিশ্বের দুর্ভাগ্য এই যে এখানে ইসলামের প্রকৃত অর্থ নিয়ে যেমন বিভ্রান্তি রয়েছে তেমনি বিভ্রান্তি রয়েছে আধুনিকতার যথার্থ স্বরূপ নিয়েও। পাশ্চাত্য ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানের অভাবে অনেক লোক মনে করে যে ইসলাম চৌদ্দ শত বছরের একটি পুরাতন জীবন দর্শন এবং এটা মূলত পারলৌকিক বিষয়াদি নিয়েই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবর্তিত। তাই এরা ইসলাম ও আধুনিকতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে মনে করে। এদের এ ধারণাটি একেবারেই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম চৌদ্দশত বছর নয় বরং চৌদ্দ হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন। কেননা ইসলামের আসল প্রবর্তক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সব নবী-রাসুল ছিলেন এর প্রচারক। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) -এর হাতে এসে ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে ইসলাম এখানে এসে স্থবির হয়ে গেছে। বরং এর মানে হলো ইসলামের মৌল কাঠামোর পরিপূর্ণতা অর্জন। ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের বহিরাবরণের যুগোপযোগী সামঞ্জস্য বিধানের পথে কোন অন্তরায় আগেও ছিল না, বর্তমানেও নেই। এভাবে প্রতিনিয়ত জীবনী শক্তি আহরণের মাধ্যমে ইসলাম সদা চিরনতুন ও আধুনিক রূপ লাভ করতে থাকে। প্রাচীনত্ব ও আধুনিকত্বের সমন্বয় সাধনের এক চিরন্তন ব্যবস্থাই ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই পুরাতন বলে অনাধুনিক এ অপবাদ অন্য ধর্মের বেলায় প্রযোজ্য হলেও ইসলামের বেলায় এটা মোটেও প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে পরলোকে বিশ্বাস ইসলামী জীবন দর্শনের অন্যতম ভিত্তি হলেও শুধুমাত্র পারলৌকিক বিষয়াদি নিয়ে ইসলাম ব্যস্ত নয়। ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে ইহলৌকিক বিষয়াদি নিয়ে এতো বেশি আলোচনা রয়েছে যে এর আলোকে সব যুগের সব সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে ইসলামই হচ্ছে সব যুগের উপযোগী একমাত্র আধুনিক ও কালজয়ী দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।

অন্যদিক দিয়ে নজর করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম যেখানে আমাদেরকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মজবুত ভিত্তি এবং কর্মের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী সমাধান যোগাতে সক্ষম, সেখানে ইসলাম ছেড়ে অন্য কোন মতবাদের অনুসারীরা পদে পদে শুধু হতাশা ও বিভ্রান্তির মায়াজালে আবদ্ধ। বিশ্বাস করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনকেই অনেকে আধুনিক বলে মনে করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞান যেখানে প্রতিনিয়ত তার অবস্থান পরিবর্তন করতে অভ্যস্ত সেখানে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কোন দর্শনকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হবে ? তদুপরি বিভিন্ন গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে ইসলামের যাবতীয় দর্শনই বিজ্ঞানভিত্তিক। যদি কোথাও বিপরীত কিছু পরিলক্ষিত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞান আজো সে স্তরে উন্নীত হতে পারেনি যেখানে পৌঁছালে আজকের এ আপাত গোচরীত বৈপরিত্য আর নজরে পড়বে না। কর্ম ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেকে আবার সমাজতন্ত্র ও পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আধুনিক মনে করে থাকে। দীর্ঘদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে সেখান থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য হাজার হাজার মানুষের জীবন কোরবানী দেয়ার যে দৃশ্য সম্প্রতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার পর এ ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণের জন্য আর কোন আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। আর পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেভাবে ধন বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে যার পরিণামে জগৎব্যাপী অশান্তির যে কালো ছায়া অতিদ্রুত নেমে আসছে তাতে এর পক্ষে প্রশংসাসূচক কোন মন্তব্য করার অবকাশ নেই। সুতরাং এদিক দিয়েও ইসলামকে অনাধুনিক বলার কোন জো নেই।

বস্তুত আধুনিকতার মূল কথা যদি হয় মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণের জীবন-তাহলে ইসলাম ছাড়া অন্য জীবন ব্যবস্থাকে আধুনিক বলে গ্রহণ করার কোন পথ নেই। কেননা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা যে মানব জীবনে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না তা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক দিয়েই প্রমাণিত।

ইসলাম ও আধুনিকতা নিয়ে অপর যে বিভ্রান্ত রয়েছে তা হলো অনেকে মনে করে যে আধুনিক জীবন মানেই অনৈসলামিক জীবন। এরাও ইসলাম ও আধুনিকতার মাঝে একটি দ্বন্দ্বে রয়েছে বলে মনে করে তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। এ ধরনের বিভ্রান্তির মূল কারণ একদিকে যেমন জীবনের মূল ধারা থেকে এদের বিচ্ছিন্নতা, তেমনি অন্য দিক থেকে আধুনিক জীবনোপকরণের ইসলামসম্মত ব্যবহার ও প্রয়োগের অনুপস্থিতি। মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এরা আধুনিক জীবন ও আধুনিকতার প্রাণস্পন্দন বুঝতে সক্ষম নয় বিধায় ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণেও অপারগ। অন্য দিকে এ কথাও সত্য যে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে আধুনিক জীবনোপকরণের ইসলামসম্মত ব্যবহার ও প্রয়োগের সযত্ন প্রয়াস অনুপস্থিত বলে এগুলোর ইসলামী চরিত্র নির্ণয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক।

মুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থাই মূলত উভয় ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরিত জীবন ও লালিত আক্বিদা-বিশ্বাসের কোন প্রতিফলন শিক্ষা ব্যবস্থায় না থাকা যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমনি যুগ চাহিদা ও জিজ্ঞাসার ছোঁয়া বিবর্জিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটিও অবৈজ্ঞানিক। দু'টোই জীবন-বিচ্ছিন্ন, তাই অবশ্যই পরিবর্তনীয়। এ পরিবর্তন যত তাড়াতাড়ি আসে ততই আমাদের মঙ্গল।

মোহাম্মাদ জাফর
সাবেক রাষ্ট্রদূত ও মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক (গবেষণা), দি ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটি বাংলাদেশ

Ghazzali and Purification of Heart

Abu Hamid Al-Gazzali was born in AD 1058 and died in the year 1111 AD. During this relatively short life span of 53 years he authored about 400 books. The life and works of Abu Hamid Al-Gazzali is a vast subject. His greatest work is considered to be his " Ihya Ulum al-Din '(Revival of the Religious Sciences). The title of the book sums up his achievements. For he revitalised Islam at a time when its inner reality (The Tariqa of religion) was under threat from over-concern with outer form (sharia). As he said, "those who learned about, for example, the laws of divorce, can tell you nothing about the simpler aspects of spiritual life, such as the meaning of sincerity towards God or trust in Him".

Al-Gazzali is a towering figure in Islamic scholasticism and mysticism. The dominant view of Al-Gazzali is quite succinctly summarised by Professor Anne Marie Schimmel, the long time professor of Indo-Muslim culture at Harvard University. I quote,

> "All that Gazzali teaches… is only to help man lead a life in accordance with sacred law, not clinging exclusively to its letter but by understanding of its deeper meaning, by sanctification of the whole life, so that he is ready for the meeting with his Lord at any moment….. this teaching – a marriage between mysticism and law has made Gazzali the most influential theologian of medieval Islam" (Inner Dimension of Islamic Worship)

The sanctification of life in preparation of meeting one's Lord – underlines Gazzali's whole life. The purification of the heart is the purpose of life to meet Almighty Allah. The Holy Quran in its Ayat in Sura Shuara says "The Day whereupon neither wealth nor sons will avail, But only he that brings to Allah a sound heart." Only to them will belong "The Garden of Bliss." Inheritance of the Garden of Bliss is for those who come with a heart pure and whole, but equally important is to meticulously follow the footsteps of the Prophet peace be upon him. If you love God, follow me, and God will love you and forgive yours sins." (Surah Al-Imran 3:31)

Gazzali questioned about the religious conformism what we may call in modern times "indoctrination". He records that inherited belief "lost their grip on me, for I saw that Christian youths always grew up to be Christians, Jewish youths to be Jews and Muslim youths to be Muslims." I heard too, that tradition (Hadith) related to the prophet of God according to which he said 'Everyone who is born with a sound nature (fitra), it is his parents who make him Jew, Christian or a Magian (Zoroastrian)'. Therefore, it became a life's search for Gazzali to find out the nature of "fitra", the sound nature of man.

Al-Gazzali left his teaching post at Nizamiya Academy on the reflection, That "I saw that it was not directed to God but rather instigated and motivated by the quest for fame and widespread prestige".

What is the nature of the way Gazzali speaks of. In his words, "purification consists above all of cleansing the heart of everything which is not God, the Almighty". This begins not with the state of sacralisation which opens prayer, but by fusion of the heart with God's name and is completed by the total annihilation of the self in God".

Gazzali considers this as a first step in the mystical journey. One begins to receive inspirations and "visions" and through "vigils they even see angels and the spirit of the prophets. They hear their voices and have the benefit of their counselling. From these visions of images and symbols they ascend further to degrees of spirituality which cannot be described. Nobody can attempt to express these states of the soul without failing miserably".

Gazzali warns that anyone who experienced such spiritual ecstasy and achieved nearness to God should not speak about it. Whatever has happened has happened. "The aim of their (sufis) knowledge is to lop off the obstacles present in the soul and to rid oneself of its reprehensible habits and vicious qualities in order to attain thereby a heart empty of all save God and adorned with the constant remembrance of God".

He studied and learnt about all Sufi theories: "It became clear to me that their distinctive characteristic that can be attained not fully by study, but rather by fruitional experience (experience of pleasure) and the state of 'ecstasy' and the exchange of qualities." "In the course of these periods of solitude things impossible to enumerate or detail in depth were disclosed to me. This much I shall mention, that profit may be derived from it: I know with certainty that the sufis are those who uniquely follow the way to God Most High, their mode of life is best of all, their way the most direct of ways, and their ethic the purest. Indeed were one to combine the insights of intellectuals, the wisdom of the wise and the love of scholars versed in the mysteries of revelation in order to change a single item of sufi conduct and to replace it with something better, no way to do so would be found. For all their motions and quiescence, exterior and interior are burned from the light of the niche of prophecy. And beyond the light of prophecy there is no light on earth from which illumination can be obtained."

The "key" to the purification of "heart" is analogous to the beginnings of prayer. (Allahu Akbar – Tahrim), is the utter absorption of the heart in remembrance of God. Its end is being completely lost in God."

The following poem originally written in Arabic was found under his pillow after his death:

"Say unto brethren when they see me dead,
And weep for me, lamenting me in sadness:
'Think ye I am this corpse ye are to bury?
I swear to God, this dead one is not I.
I in the Spirit am, and this my body
My dwelling was, my garment for a time...
I praise God who hath set me free, and made
For me a dwelling in the heavenly heights,
Ere now I was a dead man in your midst,
But I have come to life, and doffed my shroud."

Syed Rezaul Karim
Member, Executive Committe, Gulshan Central Masjid & Iddgah Society

স্রষ্টাপ্রেম ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা

ইসলামে মানুষের হৃদয়বৃত্তির ব্যাপক একটি ভুবনের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যেখানে ভালোবাসাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বা খাটো করে দেখা হয়েছে। ভালোবাসা কোনো স্বীকৃতি বা আদায়ের বিষয় নয়, বরং তা এমন এক অনুভূতি যার প্রভাবমুক্ত থাকা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। ভালোবাসা এমন একটি বিষয় যা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলেও অন্যের মন পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়; আবার যাকে কোনোভাবে গোপন রাখাও সম্ভব নয়। ফুলের সুবাসের মত, সূর্যের আলোর মত তা প্রকাশ পাবেই। 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ স্বভাবতই নিজেকে ভালোবাসে। এ কারণে সে তার স্রষ্টাকেও ভালোবাসে। মূলত ভালোবাসা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত, একটি হলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির ভালোবাসা আর অপরটি হলো সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির ভালোবাসা। নিজের প্রতি ভালোবাসার মূলসূত্র ধরেই মানুষ তার বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি উপকারীকেও ভালোবাসে। আর এ ভালোবাসা পেতেই সে অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আরাম-আয়েশ ভোগ করতে একের পর এক নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার করে চলেছে। মানবজাতির স্রষ্টা নিজেও তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসার পাত্রের জন্য পৃথিবীকে সুশোভিত করে সাজিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসে।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত-৫৪)

মানুষকে সৃষ্টিগত দাবি অনুসারেই সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসতে হবে এবং তিনি যে পথ অনুসরণ করতে বলেছেন তা অনুসরণ করতে হবে। স্রষ্টাপ্রেম হবে সব ভালোবাসার ঊর্ধ্বে এবং সে পথ হবে সব পথের ঊর্ধ্বে। তাহলেই হবে সৃষ্টির সার্থকতা এবং স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সুসম্পর্ক। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা স্রষ্টা প্রদত্ত একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য বিষয়; তাই এটি মানব মন ও দৈনন্দিন জীবনে ঈমানের দাবি। প্রাকৃতিক পরিবেশের অপরূপ সৌন্দর্য তথা গাছ-পালা, ফুল-পাখি, নদী-সমুদ্র, আকাশ এবং নানা মনোহারিণী বিষয়কে না ভালোবাসলে নিজের সন্তানকেও ভালোবাসা যায় না। তেমনি সৃষ্টিজগৎকে না ভালোবাসলে স্রষ্টাকেও ভালোবাসা যায় না। ফলশ্রুতিতে কোনো রকম প্রত্যাশা ছাড়াই মানুষ প্রকৃতিপ্রেমে নিমগ্ন হয়, অনেকে আপজনহীন হয়েও একদল অনাত্মীয়ের ভিড়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কেউ অসহায় কোনো মানুষ, শিশু বা জীব-জন্তুকেও নিঃস্বার্থে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে কেন্দ্র করে নিজের জীবন চলার পথ বদলে ফেলে। মানবপ্রেম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আর-রূম, আয়াত-২১)

জাগতিক সব কাজ-কর্ম ও নেক আমল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সুদৃঢ় করার উপলক্ষ মাত্র। সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভই ধর্মপ্রাণ মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার সম্বল। স্রষ্টাপ্রেম অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে তাঁর প্রতি গভীর ধ্যানমগ্নতা, আত্মসমর্পণ ও মনোনিবেশ করা। সমগ্র সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে ভালোবাসে, আর স্রষ্টা নিজে তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে ভালোবাসেন। মানবীয় গুণাবলির বিকাশ সাধন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরপারে পরিত্রাণ লাভ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ বাস্তবায়নে ও তাঁর ভালোবাসা অন্তরে স্থান দেয়া ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে দিকনির্দেশনা প্রদান করে ঘোষিত হয়েছে, 'বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১)

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব শ্রেণীতে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠতম পাত্র হচ্ছেন বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত নবীকুল শিরোমণি হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। কারণ এ উম্মতের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও অবদান সবচেয়ে বেশি। নবী করিম (সা.) তাঁর উম্মতকে দুটি কারণে ভালোবাসবেন। ১. যারা তাঁর আনীত বিধি-বিধান তথা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করবে। ২. তাঁকে ভালোবেসে যারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁর ভালোবাসার পাত্র হয়েছিলেন। ইসলামী শরিয়তে নবী করিম (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য, যার অবর্তমানে ঈমানই পরিশুদ্ধ হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বাণী প্রদান করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমগ্র বিশ্ববাসী অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হব।' (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন, 'তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের খবর দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে সক্ষম হবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।' (মুসলিম)

মানুষ যে উৎসের প্রেক্ষিতে একে অপরকে ভালোবাসে, এ সম্পর্কে গভীরভাবে বিবেচনা করলে নির্দ্বিধায় বলতে বাধ্য হবে– আমার প্রেম-ভালোবাসা, জীবন-মৃত্যু, আমার সর্বস্ব সেই মহান সত্তার জন্য নিবেদিত, যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা; যেমনভাবে বলেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.)। পবিত্র কোরআনের ভাষায়, 'নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও মরণ- সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য- যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।' (সূরা আল-আনআম, আয়াত-১৬২) তাই মুমিন মুসলমান হতে হলে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষকে তার জীবন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে। তাঁর হুকুম-আহকাম বা বিধি-বিধানগুলো শুধু জাহান্নামের ভয়েই নয়, বরং স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার জন্য পালন করতে হবে।

সৃষ্টিকর্তা মানুষের স্বভাব-চরিত্রে যে প্রেমবোধ দিয়েছেন তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সর্বব্যাপী। তাই মানুষ আপনজনের গণ্ডি ছাড়িয়ে তার ভালোবাসা আশপাশের সুবিস্তৃত পরিবেশমণ্ডলীতে ছড়িয়ে দেয়। ফলে দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং হৃদয়ের টান একজন মানুষের পক্ষ থেকে অন্য মানুষ অবশ্যই পেতে পারে। ভালোবাসার পাত্র হতে পারেন সন্তান-সন্ততির জন্য তার পিতা-মাতা, মা-বাবার জন্য তার ছেলে-মেয়ে, ভাইয়ের জন্য বোন, বোনের জন্য ভাই এবং অপরাপর আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী যে কোনো আপনজন। একজন মানবের ভালোবাসা একজন মানবীও পেতে পারেন। তবে সে ভালোবাসা হতে হবে বৈধ ও অনুমোদিত। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা কেবল শরিয়তের অনুমোদনের গণ্ডিতেই আবদ্ধ নয়; বরং তা বহুবিধ পুণ্যময় কাজ। ভালোবাসা পোষণ ও প্রকাশের বৈধ কোনো সম্পর্ক ছাড়া ইসলামে একজন মানব-মানবীর মধ্যে হৃদয়ের কোনো টান থাকা এবং প্রেমকে আরো গভীর করার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে একজনের প্রতি অন্যের ভালোবাসা হতে হবে 'ফিল্লাহ' বা আল্লাহর ওয়াস্তে। অর্থাৎ আমি তাকে ভালোবাসব এজন্য যে, তার প্রতি আমার ভালোবাসা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত। কেননা যারা মুমিন তারা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

সুতরাং ইহকাল ও পরকালে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এবং রাসূলের প্রদর্শিত ধর্মের পথে চলতে হবে। যে ব্যক্তি স্রষ্টাপ্রেমের দাবিদার তার কথায়, কাজে, চিন্তায়, চর্চায় এক কথায় জীবনের সর্বস্তরে বিশ্বনবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ সম্ভবপর হলেই সফলকাম হওয়া যাবে।

[রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন - দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ গভীর রাতে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে । (২) যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারাদারীতে রাত কাটায় । (কানযুল উম্মাল)]

প্রাত্যহিক জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলে করিম (সা.)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন আর নিষেধকৃত কার্যাবলী বর্জনই হোক মুমিনের একমাত্র ব্রত।

প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ একাকী জীবন ধারণ করতে পারে না। পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে তার বসবাস। সে কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নিছক কোনো প্রাণী নয়। কোনো কারণে সে পরিবার-পরিজন থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হলেও প্রতিবেশী থেকে সে কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যেখানে যায় সেখানেই তার কোনো না কোনো প্রতিবেশী থাকে। পরিবার থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হলে প্রতিবেশী তখন তার পরিবারের অভাব পূরণ করে। বিপদে-আপদে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তাই মানুষের জীবনে প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে বসবাস করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। এর সুবাদে গড়ে উঠেছে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশীসুলভ মানসিকতা ও আচার-আচরণ। প্রতিবেশী কারা? কতোদূর এর সীমা? এমন এক প্রশ্নের জবাবে হজরত হাসান (রা.) বলেছেন, 'নিজের ঘর থেকে সামনে চল্লিশ ঘর, পেছনে চল্লিশ ঘর, ডানে চল্লিশ ঘর এবং বামে চল্লিশ ঘরের অধিবাসীরা হচ্ছে প্রতিবেশী।' আর এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পড়শী, নিকটবর্তী, পাশাপাশি হওয়া, পার্শ্ববর্তী ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনের ভাষ্য মতে তিন শ্রেণীর লোক প্রতিবেশী ১. যারা আত্মীয় এবং প্রতিবেশী। ২. যারা শুধু প্রতিবেশী। ৩. সহচর, সহকর্মী এবং অধীনস্থ লোক। এরা সবাই প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত।

জীবনের তাগিদে সমাজবদ্ধ মানুষকে অন্যান্য মানুষের সাহায্য নিতে হয়। মানুষ তার অসংখ্য প্রয়োজনের জন্য অসংখ্য মানুষের মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ সমাজের লোকদের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে না উঠবে, ততক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করতে পারবে না। তাই মানুষের পরস্পর প্রতিবেশীর সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করা উচিত। আর এ সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য পরস্পর ঐক্যের বিশ্বাস স্থাপন করা এবং একে অন্যের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণের তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে, 'আর আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। 'আর তোমরা পিতামাতা, নিকট আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথিক এবং যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে তাদের সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-গর্বিতজনকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণের বিষয়ে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমাজ জীবনে প্রতিবেশী সবচেয়ে কাছের লোক। সুখে-দুঃখে সবার আগে তাকে পাওয়া যায়, এজন্য তার হকও বেশি। প্রকৃতপক্ষে মানুষ চিন্তা করে না তার প্রতিবেশী ব্যক্তিটি সে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যেই হোক না কেন, সে তার নিকটতম ব্যক্তি। সার্বক্ষণিক তার সান্নিধ্য আশা করা যায়। বিপদ-আপদ, সুখে-দুঃখে তার সান্নিধ্য পাওয়া যেতে পারে। তদ্রূপ এক প্রতিবেশীও অন্যের কাছ থেকে অনুরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'জিব্রাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে এমনি তাগিদ করতে লাগলেন, আমার ধারণা হচ্ছিল হয়তো তাকে সম্পদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হবে।' (বুখারী ও মুসলিম) অনুরূপ একাধিক হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত জাবির (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে আশঙ্কা করছিলেন হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর কত অধিকার রয়েছে।

[রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন - "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত ও কঠিন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হবে জালিম শাসক"। (তিরমিযি)]